ইলিশে আরও একটি সুখবর: প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম

বছরে সাড়ে ৪ হাজার কোটি জাটকা নতুনভাবে সংযোজিত হবে

কৃষিবিদ মো. আরিফুল ইসলাম

ভূমিকা

ইলিশ মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে রোল মডেল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ইলিশ। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ আসে ঝকঝকে রূপালী ইলিশ থেকে। বাংলাদেশের পরই ইলিশ উৎপাদনে রয়েছে যথাক্রমে মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া বাকি ১০টি দেশেই ইলিশ উৎপাদন কমেছে। একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশ উৎপাদন প্রতি বছর ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। আর সিংহভাগ প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ইলিশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। আর সমানে ইলিশের জন্য রয়েছে একটি সুখবর। বরিশালের সদর, হিজলা ও মেহেদিগঞ্জ উপজেলায় ইলিশের ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। নতুন এ অভয়াশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতি বছর আরো সাড়ে ৪ হাজার কোটি জাটকা নতুনভাবে সংযোজিত হবে। যা ইলিশের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করবে।

নতুন ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বরিশালের সদর, হিজলা ও মেহেদিগঞ্জ উপজেলায় ইলিশের ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এ অভয়াশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতি বছর আরো সাড়ে ৪ হাজার কোটি জাটকা নতুনভাবে সংযোজিত হবে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩লাখ ৯৪ হাজার ৯৫১ মে. টন। নতুন এ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে ইলিশের উৎপাদন আরো বাড়বে বলে দাবি করছেন গবেষকরা। গত ০৮ নভেম্বর ২০১৭ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ওই অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের জন্য চিহ্নিত এলাকাসমূহ হচ্ছে- বরিশাল জেলার সদর ও মেহেদিগঞ্জ উপজেলার কালাবদর নদীর ১৩.১৪ বর্গ কিলোমিটার, মেহেদিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার গজারিয়া ও মেঘনা নদীর যথাক্রমে ৩০ বর্গ কিলোমিটার এবং ২৭৪.৮৬ বর্গ কিলোমিটার। প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম এলাকার নদীসমূহের মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮২ কিমি. এবং আয়তন হচ্ছে ৩১৮ বর্গ কিলোমিটার।

মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে যে, দীর্ঘ ৫ বছরে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত গবেষণায় উল্লিখিত ৩টি নদীতে জাটকার প্রাচুর্যতা, পানির গুণাগুণ এবং জাটকার খাদ্য প্ল্যাংকটনের আধিক্যতার ভিত্তিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে অভয়াশ্রম ঘোষণার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মৎস্য অধিদপ্তর সরেজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৩টি নদীর মোট ৮২ কিমি. এলাকাকে অভয়াশ্রমের জন্য চিহ্নিত করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে যে, ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষণার জন্য সরকার শীঘ্রই গেজেট প্রকাশ করবে এবং উক্ত এলাকায় মার্চ-এপ্রিল মাসে মাছ ধরা বন্ধ থাকবে।

বিএফআরআইয়ের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ জানান, অভয়াশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতি বছর আরো সাড়ে ৪ হাজার কোটি জাটকা নতুনভাবে সংযোজিত হবে এবং ইলিশের উৎপাদন আরো বাড়বে। তিনি আরও জানান, দেশের মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে বিএফআরআইয়ের গবেষকরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের গবেষণায় ও সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের ফলে দেশে ইলিশের উৎপাদন অনেক বেড়েছে।

বর্তমান পাঁচটি অভয়াশ্রম

বর্তমানে চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিমি. এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত

মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালীর চর রুস্তম পর্যন্ত তেতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকা, এবং শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার নিম্ন পদ্মার ২০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশের ৫টি অভয়াশ্রম রয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের কারণে বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে।

অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা

ইলিশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ও জেলেদের কর্মসংস্থানে বিষয়টি বিবেচনা করে নিম্নে বর্ণিত অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমেও জাটকা পূর্ণাঙ্গ ইলিশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত।

সারণী: অভয়াশ্রম এলাকা ও ইলিশ ধরার নিষিদ্ধ সময়

ক্রমিক নং	অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১.	নিম্ন মেঘনা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
২.	শাহবাজপুর চ্যানেল	ঐ
৩.	তেঁতুলিয়া নদী	ঐ
৪.	নিম্ন পদ্মা নদী	ঐ
৫.	আন্ধারমানিক নদী	নভেম্বর-জানুয়ারি (মধ্য কার্তিক হতে মাঘ)
৬. (প্রস্তাবিত)	মেহেদিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার গজারিয়া ও মেঘনা নদীসহ মোট ৩১৮ বর্গ কি.মি. এলাকা	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)

উৎসঃ বি এফ আর আই

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি পালন

জাটকা ইলিশ হচ্ছে ০-৯ ইঞ্চি সাইজের ইলিশ। যা স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন হিসেবেই অপরিপক্ক মাছ। বিজ্ঞগণ মনে করেন, এই জাটকা ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেলেই কেবল দেশের নদ-নদিতে ইলিশ মাছের প্রাচুর্যতা ফিরে আসতে পারে। দেশে জাটকা ইলিশ ধরার জন্য প্রতি বছর এ মাছের প্রাকৃতিক পুনঃমজুদ কার্যক্রম ক্রিয়া ঘটতে পারছেনা। যে জন্য পরিণত পরিমাণে আসার আগেই জাটকা ধরার কারণে তার অপমৃত্যু ঘটছে। সংগত কারণেই ইলিশ মাছের উৎপাদন বাড়ানোর স্বার্থে জাটকা ইলিশ জাটকা হত্যা বন্ধ করা জরুরি। দেশের জননন্দিত মাছ হিসেবে ইলিশের সমাদর আদিকাল থেকেই।

জাটকা ইলিশের আশ্রয়স্থল

ইলিশ সাধারণত প্রধান প্রধান নদীতে ডিম দিয়ে থাকে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, মেঘনার ধলচর, মৌলভীর চর, মনপুরা ও কালির চর ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। নদীর মোহনার এ জায়গায় জুলাই হতে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে জলে তেমন লবণাক্ততা থাকেনা, জল এসময় খুব ঘোলাটে থাকে জোয়ার-ভাটার কারণে। তাই এই জায়গাকে ইলিশ ডিম ছাড়ার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয়। মৎস্য অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, মার্চ ও এপ্রিল মাসে মেঘনার নীলকমল ও হাজিমারাতে প্রচুর জাটকা ইলিশ ধরা পড়ে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এ সময়ে কুয়াকাটা ও দুবলারচর এ কীর্তনখোলা, কারখানা, পায়রাসহ শিবশা নদীতেও এ মাছ পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জাটক বিচরণক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়েছে বেশ দ্রুত। একদিকে জলবায়ুগত পরিবর্তন, অপরদিক হলো মানুষের সৃষ্ট আচরণগত কারণে।

জাটকা সংরক্ষণে পদক্ষেপ

বাজারে অহরহ জাটকা ইলিশ পাওয়ার কারণে, এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের ব্যবহার না থাকায় অনেকে উৎসাহী হচ্ছে। ফাঁস জাল, মসারী জাল, বেহুন্দি ও বেড় জালের ব্যাপক

ব্যবহারের জন্য জাটকা ইলিশ ধ্বংশ হচ্ছে। ক্ষতিকর এসব জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। আজকের জাটকা ইলিশ আগামী দিনের বড় ও প্রজননক্ষম ইলিশ। তাই জাটকা ইলিশ মাছের আহরণের নির্ধারিত সময়ে ঐ বিচরণ এলাকাকে "নো ফিসিং জোন" এলাকা ঘোষণা দিয়ে এদেরকে রক্ষা করা যায়। ডিম ছাড়ার সময়ে নির্ধারিত এলাকাকে সংরক্ষণ করে এবং ঐ এলাকাতে কোন ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে না দিয়ে প্রজননক্ষম ইলিশ মাছকে বিচরণের সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে ডিমও আসে এবং খোকা ইলিশ বাড়তে পারে। মৎস্যজীবিদের ইলিশ আহরনের অলস সময়ে বিকল্প আয়ের ব্যাবস্থা করেও কাঙ্খিত ফল আসছেনা। কারণ জেলেদের ও আইনের প্রায়োগিক সংস্থার

অসাধুতার জন্য জাটকা ইলিশ ধরা, বিক্রয় ও খাওয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে তা ধ্বংস হচ্ছে। এজন্য মৎস্য বিভাগকে ডেপুটেশন লোকবলের ওপর নির্ভর না করে, নিজস্ব লোকবল তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে এখানে কঠোর জবাবদিহিতার আয়োজন রাখতে হবে। যে লোকবলে থাকবে, আইন প্রায়োগিক কর্মকতা, পুলিশ সদস্য, বিশেষজ্ঞ, লেবারসহ প্রয়োজন নিজস্ব জনবল ও আদালত। যেন তাৎক্ষণিক প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধির সাজা ও জরিমানার ব্যবস্থা করা যায়। এজন্য সরকারের ও এলাকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিচারের জুরি বোর্ড গঠন করে তাৎক্ষণিক আদালত পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে সর্বাগ্রে দরকার সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম করা, নির্ভয় বিচারণস্থলসহ প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় উপাদান।

প্রজনন মৌসুমে বিচরণক্ষেত্র

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বছর ২২ দিন দেশব্যাপী মা ইলিশ রক্ষা অভিযান পরিচালিত হয়। চলতি বছরে মা ইলিশ রক্ষায় ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাসহ দেশের ২৭ জেলায় ইলিশ আহরণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন, মজুদ ও বিনিময় কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে- চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত এলাকাসমূহ হচ্ছে- ভোলা জেলার মনপুরা ও ঢালচর এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, কালিরচর ও মৌলভীরচর। ইলিশের জীবনচক্র বৈচিত্র্যময়। এরা সাগরের লোনা পানিতে বসবাস করে। প্রজনন মৌসুমে ডিম দেয়ার জন্য উজান বেয়ে মিঠা পানিতে চলে আসে।

বিশ্বে ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন

পৃথিবীর মোট ১১টি দেশে ইলিশ পাওয়া যায়। দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। বিশ্বে আহরিত ইলিশের প্রায় ৬০% ইলিশ বাংলাদেশ আহরণ করে; দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মায়ানমার (২০-২৫%) এবং ৩য় অবস্থানে ভারত (১৫-২০%)। উল্লেখ্য, ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া অপর ১০টি দেশেই ইলিশ উৎপাদন কমেছে। সুষ্ঠু ও সঠিক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের কারণে একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশ উৎপাদন সাম্প্রতিককালে প্রতি বছর ৯-১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। ইলিশের মোট আয়ুষ্কাল ৫-৭ বছর। আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রথম দুই বছর পুরুষ ও স্ত্রী মাছ একই হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু, ৩য় বছরে গিয়ে স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। আহরিত ইলিশের শতকরা ৯০ ভাগ ৩০-৫০ সেন্টিমিটার আকারের হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মোট ৩ প্রজাতির ইলিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২টি (চন্দনা ও গোরতা ইলিশ) সারাজীবন সাগরে কাটায় এবং অপর ১টি মিঠা পানি ও লোনা পানিতে জীবন অতিবাহিত করে।

জেলেদের পুনর্বাসন

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবেই দরিদ্র। ইলিশ ও জাটকা ধরার জন্য তিনটি শ্রেণী যথা-নৌকার মালিক, প্রধান মাঝি ও নাবিক জড়িত। নৌকা মালিক তার নৌকা ও জাল প্রধান মাঝিকে ভাড়া দেয়, মাঝি পরিচালনা করে এবং সাধারণ নাবিকগণ মাছ ধরে। নাবিক জেলেদের বাৎসরিক আয় মাত্র ১৪,৪০০ টাকা যা অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭% এবং জাতীয় গড় আয়ের মাত্র ২৫%। ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যে সমস্ত জেলে প্রধান পেশা হিসাবে ইলিশ মাছ আহরণের ওপর নির্ভরশীল, তাদের ৬০% এর চাষযোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর। অনেকের নিজস্ব বাসস্থানও নেই, ৬০ ভাগেরও বেশি লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্ন আয়ের শ্রেণীভূক্ত। বিকল্প কোনো কাজ থেকে আয়-উপার্জনও অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই জীবিকা নির্বাহ ও বেঁচে থাকার জন্য তারা জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়। এ কারণে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করা অপরিহার্য। জাটকা ও মা মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে বর্তমান সরকার জেলেদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

একক প্রজাতির মাছ একমাত্র ইলিশ থেকেই জিডিপিতে ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আসে। পৃথিবীর মোট ইলিশের প্রায় ৬০-৭০ ভাগই ধরা পড়ে বাংলাদেশে। দেশের ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির জোর চেষ্টা করে আসছে দেশের মৎস্য অধিদপ্তর। সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের ফলে গত কয়েক বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। প্রতি বছরই বাড়ছে ইলিশের উৎপাদন। মাত্র দেড় দশকের ব্যবধানে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ২ লাখ টনেরও বেশি। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে যেখানে ১ লাখ ৯১ হাজার টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। ২০১৩-১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে ইলিশের উৎপাদন ৩.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। আর গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে

৩ লাখ ৯৫ হাজার টন বা ৪ লাখ টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে। এ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। নদীর মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকার জেলেদের বাঁচিয়ে রেখে ইলিশ রক্ষার নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। একক প্রজাতি হিসেবে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মৎস্য উৎপাদনের ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১১-১২%, বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৩ লাখ মে.টন যার মূল্য প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান ১.০% এবং প্রতি বছর ৫০-৬০ কোটি টাকা ইলিশ রপ্তানি

থেকে আয় হয়। প্রায় ১৪৫ টি উপজেলার ৪,৫০,০০০ জেলে পূর্ণ (৩২%) অথবা খন্ডকালীন সময়ে (৬৮%) ইলিশ মাছ আহরণ করে। সার্বিকভাবে ২০-২৫ লাখ লোক ইলিশ মাছ বিক্রয়, পরিবহন, ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন-জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। ইলিশ মাছ খাদ্যমানেও সমৃদ্ধ। এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ, অসম্পৃক্ত চর্বি ও খনিজ পদার্থ, তেলে উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন এ ও ডি থাকে এবং কিঞ্চিৎ বিও মেলে। ইলিশ মাছের চর্বিতে প্রায় ২% ওমেগা ও ফ্যাটি এসিড থাকায় এ মাছ খেলে মানুষের দেহের রক্তের ও কোলেস্টেরেলের মাত্রা হ্রাস পায়। এ মাছের স্বাদ ও গন্ধ মাছের তেলের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। ইলিশ থেকে গড় প্রায় ৬০% খাওয়ার উপযোগী মাছ (ফ্রেস) পাওয়া যায়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে প্রাচীনকাল থেকেই ইলিশ মাছ সম্পৃক্ত।

ইলিশের পুষ্টিগুণ

জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের পাশাপাশি মানবদেহের প্রয়োজনে ইলিশের অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শরীরের পুষ্টি রক্ষা এবং বৃদ্ধি সাধনে ইলিশের প্রয়োজন অপরিসীম। কেননা প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশ মাছে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ০.১৮ গ্রাম, ফসফরাস ০.২৮ গ্রাম, লৌহ ২১৩ মিগ্রাম পাওয়া যায়। এছাড়া এই মাছের মাংসে খাদ্য উপাদানে রয়েছে অ্যাশ ২.২%, পানি ৫৩.৭%, বডি ফ্যাট ১৯.৪% এবং প্রোটিন ২১.৮% বিদ্যমান থাকে। যে জন্য ইলিশ স্বাদ ও মুখরোচক খাদ্য হিসেবে বিশেষ করে বাঙ্গালির কাছে এত প্রিয়। ইলিশে খাদ্যের প্রাণিজ আমিষের অবদান ৯.৫%। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, মাছের চর্বি বহুমূত্রের রোগীর জন্যও উপকারী। এই চর্বি ইনস্যুলিন ক্ষরণ এবং তার কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইলিশ একটি চর্বিযুক্ত মাছ আর ইলিশে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড (ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড) রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া গেছে, এই এসিড কোলেস্টোরেল ও ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দিতে সাহায্য করে।

উপসংহার

ইলিশ বাঙালির রসনা বিলাসের এক উত্তম অনুষঙ্গই নয় দেশের অর্থনীতিতে রয়েছে অনন্য অবদান। মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ আসে এ মাছটি থেকে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে রোল মডেল। গত বছর ইলিশে স্বস্তিতে ছিল দেশের সাধারণ মানুষ। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় আরও কার্যকর ও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবাধে চলে জাটকা নিধন। এ জাটকা হত্যা ও মা মাছ রক্ষা করা গেলে ইলিশের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা উচ্চ মূল্যের জন্য ইলিশের স্বাদ ভুলতে বসেছে তাদের ঘরেও ফিরে আসুক বাঙালি ঐতিহ্যের রূপালি ইলিশের স্বাদ। আমাদের সবার সচেতনতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে ইলিশ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে রাখতে পারে সহায়ক ভূমিকা।

কৃষিবিদ মো. আরিফুল ইসলাম
কৃষি সাংবাদিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২
মোবাইলঃ ০১৭৩৭ ৫১২৯১৭